মনীষীদের স্মৃতিকথা

[ইতিহাসের পাতা থেকে আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে রাসুল, ফুকাহা, আইম্মাহ, মুহাদ্দিসীন, উলামা ও বুজুর্গানে দ্বীনের কর্মময় জীবনীর উপর স্বতন্ত্রভাবে মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি দা. বা.-এর স্মৃতিচারণ]

সংকলন

মুহাম্মদ তাকি উসমানি দা.বা.

আবদুল্লাহ আল ফারুক

অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

মনীষীদের স্মৃতিকথা
প্রথম সংস্করণ : মার্চ ২০১৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৯
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মুহাম্মদ রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশক
মাকতাবাতুল হাসান
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাংরোড, নারায়ণগঞ্জ।
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
বর্ণসজ্জা : মুহিব্বুল্লাহ মামুন
ISBN : 978-984-8012-17-8

মূল্য : ৩৮০/- টাকা মাত্র

MONISHIDER SRITIKOTHA
Writer : MUFTI MUHAMMAD TAQI USMANI
Translated by : ABDULLAH AL FARUQUE
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com
Facebook/maktabatulhasan

অর্পণ

স্নেহের সহোদর
আবদুল্লাহ আল মামুন
ইবনে সাইফী
জীবনপথ মসৃণ হোক;
আবিলতামুক্ত আবিরমাখা হোক;
সে প্রত্যাশায়।

✍ **অনুবাদক**

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	৯
হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালাম	২৫
হজরত ইউশা আলাইহিস সালাম	২৬
হজরত হিযকিল আলাইহিস সালাম	২৭
হজরত আবু উবায়দাহ বিন জাররাহ রাদি.	২৮
হজরত আবু দারদাহ রাদি.	৩৫
হজরত উম্মে হাবিবাহ রাদি.	৩৬
হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম রাদি.	৪০
হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ রাদি.	৪২
হজরত আসমা বিনতে উমায়স রাদি.	৪৩
হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদি.	৪৪
হজরত আবু সালাবাহ খুশানি রাদি.	৪৬
হজরত আবু মুসলিম খাওলানি রাদি.	৪৬
হজরত বিলাল হাবশি রাদি.	৫০
হজরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান রাদি.	৫৩
হজরত জাফর তৈয়্যার রাদি.	৫৬
হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি.	৫৭
হজরত দিহইয়া কালবি রাদি.	৫৮
হজরত যায়দ বিন হারেসা রাদি.	৬০
হজরত সালমান ফারসি রাদি.	৬৪
হজরত শুরাহবিল বিন হাসানা রাদি.	৬৮
হজরত দিরার বিন আযওয়ার রাদি.	৬৯
হজরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা রাদি.	৬৯
হজরত উকবা বিন আমের রাদি.	৭০
হজরত আবদুল্লাহ বিন জাবের রাদি.	৭১
হজরত মুআবিয়া রাদি.	৭৫
হজরত মুআয বিন জাবাল রাদি.	৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
হজরত উকবা বিন নাফে	৮১
হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.	৮৬
হজরত ইমাম আবু হানিফা রহ.	৮৮
হজরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ.	৯১
হজরত আবু সুলাইমান দারানি রহ.	৯৮
হজরত মুসা কাযেম রহ.	৯৯
হজরত লাইস বিন সাদ রহ.	১০১
হজরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ.	১০৩
হজরত ইমাম শাফেয়ি রহ.	১০৭
হজরত আলি আর রিদা রহ.	১১০
ইমাম বুখারি রহ.	১১৩
ইমাম তিরমিজি রহ.	১৩৯
হজরত মারুফ কারখি রহ.	১৪৩
হজরত সিররি সাকতি রহ.	১৪৬
হজরত জুনাইদ বাগদাদি রহ.	১৪৮
হজরত বাকি বিন মুখাল্লাদ রহ.	১৫১
ইমাম গাজালি রহ.	১৫২
শায়খ আবদুল কাদের জিলানি রহ.	১৫৪
আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানি রহ.	১৫৬
আল্লামা আবদুল হক ইশবিলি রহ.	১৫৭
সুলতান নুরুদ্দীন যঙ্গী রহ.	১৬০
হজরত শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার রহ.	১৬২
সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবি রহ.	১৬৪
ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ.	১৬৫
শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবি রহ.	১৭০
শায়খ আবুল হাজ্জাজ মিয্যি রহ.	১৭২
আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ.	১৭৪
হাফেজ ইবনে কাসির রহ.	১৭৬
ইবনে হিশাম নাহবি রহ.	১৭৮

বিষয় **পৃষ্ঠা**

আল্লামা উমর বিন রাসলান আলবুলকীনি রহ. ১৭৮
আল্লামা সাবত ইবনুল আযামি রহ. ১৮০
আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি রহ. ১৮৩
হাফেজ ইবনে হজর আসকালানি রহ. ১৮৪
আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আল ওয়াযির আস সনআনি রহ. ১৮৬
শায়খুল ইসলাম জাকারিয়া আনসারি রহ. ১৮৮
আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. ১৯২
সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ রহ. ১৯৩
আল্লামা ইবনে আবেদিন শামি রহ. ১৯৯
আল্লামা দারদের মালেকি রহ. ২০১
হজরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. ২০২
হজরত মাওলানা মুফতি আজিজুর রহমান রহ. ২২১
হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভি রহ. ২২৬
হজরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব রহ. ২৪৩
হজরত মাওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. ২৪৭
হজরত মাওলানা সাইয়্যেদ আসগর হুসাইন রহ. ২৬০
হজরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ. ২৬৯
হজরত মাওলানা ইজাজ আলী সাহেব রহ. ২৭৫
হজরত আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানি রহ. ২৭৯

মনীষীদের স্মৃতিকথা...

হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে প্রত্যয়দীপ্ত মহান রাসুল ঘোষণা করে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের প্রশংসা করেছেন। বাস্তবতা হলো, ভূপৃষ্ঠের ওপর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মতো দৃঢ়তা ও অবিচলতা, সাহসিকতা ও নির্ভীকতার অধিকারী আর কেউ নয়। এক্ষেত্রে দুনিয়ার কোনো মানুষ তাঁদের সমকক্ষ হতে পারে না। বিশেষকরে আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সর্বশেষ নবী ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে গোটা ভূপৃষ্ঠে হেদায়েতের আলো ছড়িয়েছে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা সেই দৃঢ়তা, অবিচলতা, সাহসিকতা ও নির্ভীকতার ক্ষেত্রেও তাঁকে এতটাই পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন যে, দুনিয়ার কোনো মানুষের পক্ষে তার সম্যক কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনটাই যদিও সেই অবিচলতা ও নির্ভীকতার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, কিন্তু মানব ইতিহাস তাঁর সেই বলিষ্ঠ অবিচলতার দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ পেশ করতে পারবে না। কারণ, তিনি এমন এক সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা আদ্যোপান্ত শুধু অন্ধকার ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিতই ছিল না এবং এটির ওপর তারা গর্বও করত। তারা কখনো নিজেদের সংশোধন ও পরিশুদ্ধির চিন্তা তো করেইনি, উপরন্তু নিজেদের আকিদা, রেওয়াজ ও বংশীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কারও মুখ থেকে একটি শব্দ শুনতেও প্রস্তুত ছিল না। এমন এক সমাজে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী আগমন করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বমোট তেইশ বছরের মেয়াদ দেওয়া হয়েছিল। এমন একটি নষ্ট সমাজকে শিষ্ট বানাবার দায়িত্ব এই এক ব্যক্তির ওপরই ন্যস্ত করা হয়েছিল। পিতা-মাতার ছায়া মাথার ওপর থেকে তো শৈশবেই উঠে গিয়েছিল। নবীজির কোনো ভাই বা বোনও ছিল না। বাহ্যিকভাবে তাঁর কোনো বন্ধু বা সহায়তাকারীও ছিল না। এমন কন্টকাকীর্ণ নিঃসঙ্গ পরিবেশে, বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে সমাজসংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই দাঁড়িয়ে যান। কিন্তু তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত মেয়াদের ভেতর কার্যক্রম শেষ করে যখন তিনি ফিরে যান তখন পরিস্থিতি এতই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠেছিল যে, গোটা জাযিরাতুল আরবে একজন মুশরিকও অবশিষ্ট ছিল না। এ সময় তিনি লক্ষ সাহাবির এমন একটি কাফেলা তৈরি করে গিয়েছিলেন যাদের একেকটি কথা ও একেকটি কাজই আগামী দুনিয়ার

জন্যে মানবতার আলোকবর্তিকা হয়ে জ্বলজ্বলে আলোর বিকিরণ ছড়াচ্ছিল।

এমন বিস্ময়কর পরিবর্তন রহস্যময় মুজিযার আলোকে চোখের পলকেই সাধিত হয়নি; বরং এর জন্যে নবীজিকে চেষ্টা ও সাধনার এমন কন্টকাকীর্ণ বন্ধুর গিরিপথ মাড়াতে হয়েছিল, যা বর্তমানে শুধু কল্পনা করাই সম্ভব। জাযিরাতুল আরবের একেকটি অণু নবীজির পথে বাধার বিন্ধ্যাচল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাঁর অমিতচেতা দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রাচীরে সামান্যতম কম্পনও সৃষ্টি করতে পারেনি।

হিজরতের পূর্বে যখন সাহাবায়ে কেরামের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল, কিছু কিছু সাহাবি মনের দুঃখে নবীজির কাছে এসে নিবেদন করেছিল যে, আপনি আমাদের জন্যে কেন দুআ করছেন না? তখন ক্রোধে নবীজির মুবারক চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। নবীজি বলেছিলেন, তোমাদের পূর্বে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁর সঙ্গীদেরকে করাত দিয়ে ফেড়ে ফেলা হয়েছিল। তাঁদের শরীরের ওপর লোহার কাঁচি চালিয়ে গোশতকে হাড় থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু এই চরম পরীক্ষাও তাঁদেরকে তাঁদের দ্বীন থেকে সামান্যতম নড়াতে পারেনি। আল্লাহর কসম, এই দ্বীনে ইসলাম একটি সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হবে। অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, সনআ থেকে হজরা মাউত পর্যন্ত একজন আরোহী এমনভাবে নির্ভয়ে নিঃশঙ্কায় পথ চলবে যে, সে এক আল্লাহকে ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে ভয় করবে না।[১]

যখন মক্কার কুরাইশরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বীনপ্রচারের কাজ থেকে নিবৃত রাখার সমস্ত কৌশল অবলম্বন করেও ব্যর্থ হয়, তখন তারা তাঁকে ক্ষমতা ও শাসনভার, অর্থ-বিত্ত, সুন্দরী অভিজাত নারীর যৌবনের প্রলোভন পেশ করে। এমনকি নবীজির চাচা আবু তালেবও নবীজিকে তাদের প্রস্তাব মেনে নিতে প্রলুব্ধ করে। সেসময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই উত্তর দিয়েছেন সেটি অবিচলতা ও দৃঢ়তার ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় উত্তর হয়ে আছে। যার দ্বিতীয় কোনো নজির আজও অবধি জন্মেনি। নবীজি বলেছিলেন, চাচাজান, ওরা যদি আমার এক হাতে সূর্য, আর অপর হাতে চন্দ্র এনেও রেখে দেয় তারপরও আমি সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রচার থেকে নিজেকে নিবৃত করব না।[২]

---

১. সহিহ বুখারি

২. সিরাতে ইবনে হিশাম

প্রাণোৎসর্গের চেতনাবাহী সাহাবায়ে কেরাম যদিও সর্বক্ষণই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে বদ্ধ পরিকর থাকতেন। তারপরও বিভিন্ন যুদ্ধে দু'পক্ষের সংঘর্ষ যখন তীব্র আকার ধারণ করত, আর বড় বড় বাহাদুরের কদমও নড়বড়ে হয়ে পড়ত, তখন তারা এসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বীরত্বের ছায়াতলে আশ্রয় খুঁজতেন। নবীজির নির্ভীক সাহসী ব্যক্তিত্ব মহিরুহ হয়ে তাদেরকে পরম যতনে জড়িয়ে নিত। হজরত আলি রাদি. বলেন,

لَمَّا حَضَرَ الْبَأْسُ يَوْمَ بَدْرٍ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ مَا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْهُ

'বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন দু'পক্ষের সংঘর্ষ প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী রূপ ধারণ করে তখন আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আশ্রয় নিই। তিনি ছিলেন সমস্ত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাহাদুর। যুদ্ধচলাকালে তিনিই ছিলেন কাফেরদের সবচেয়ে কাছে'।[৩]

হজরত বারা রাদি. বলেন,

'আমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বড় বাহাদুর সাব্যস্ত হতো যে ব্যক্তি নবীজির কাছে দাঁড়াত।'[৪]

উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, মুসলমানরা মদিনার বাইরে বেরিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে আর সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক নবীজি গৃহ থেকে বর্ম পরিধান করে বেরিয়ে আসেন তখন কয়েকজন সাহাবি অভিমত পরিবর্তন করে নবীজিকে থেমে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেসময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জানিয়ে দেন,

'আল্লাহর নবী একবার বর্ম পরিধান করলে সেটি আর খোলেন না।[৫]

গযওয়ায়ে যাতুর রিকার ঘটনা। যুদ্ধের এক পর্যায়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক কাফের এগিয়ে এসে তরবারি উন্মুক্ত করে বলে ওঠে, হে মুহাম্মাদ, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? নবীজি নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দেন, 'আল্লাহ'। তখন নবীজির কণ্ঠ হতে এ পরিমাণ সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও অবিচলতা ঝরেছিল যে, তাদের

৩. মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল : ১২৬, ১৫৬

৪. সহিহ মুসলিম, গযওয়ায়ে হুনাইন

৫. সহিহ বুখারি : ২/৯। باب قول الله {وأمرهم شورى بينهم}

প্রভাবিত হয়ে সেই কাফের সাথে সাথে তরবারি কোষের ভেতর প্রবিষ্ট করে বসে যায়।[৬]

হুনাইন যুদ্ধের ঘটনা। শত্রুদলের আক্রমণের তীব্রতার মুখে সাহাবায়ে কেরামের কদম মোবারকও নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এমন চরম প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও নবীজি অবিচলতার হিমালয় হয়ে শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়পদ ছিলেন। নবীজির জবান থেকে তখন এই ঘোষণা উচ্চারিত হচ্ছিল,

أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

'আমি নবী। আমি কোনো মিথ্যাবাদী নই। আমি আবু তালেবের বংশধর'।

হজরত আনাস রাদি. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বড় বাহাদুর ছিলেন। একবার এক রাতে হঠাৎ মদিনা মুনাওয়ারায় এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, শত্রুপক্ষ মদিনার ওপর আক্রমণ করেছে। ভীত-বিহ্বল চেহারা নিয়ে সবাই যখন ঘরের বাইরে বেরোল তখন দেখা গেল, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘোড়ার উদোম পিঠে সওয়ার হয়ে জঙ্গলের দিক থেকে আসছেন। নবীজি এসে সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমাদের আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। পরে জানা গেল, সংবাদটি শুনেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই ঘোড়ার উদোম পিঠে আরোহণ করে আশঙ্কার সবগুলো স্থান চষে বেড়িয়ে এসেছেন।[৭]

মোটকথা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনই ছিল শৌর্য-বীরত্ব, সাহসিকতা ও পৌরুষের ইবাদত। যার থেকে আমরা এ শিক্ষা পাচ্ছি যে, সত্য ও ন্যায়-নিষ্ঠতার খাতিরে কোনো ত্যাগ-তিতীক্ষার প্রয়োজন দেখা দিলে পিছিয়ে থাকা যাবে না। যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পতাকা সমুন্নত করার জন্যে অবিচলতা ও স্থিরতার পরিচয় দেয় তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার জন্যে বিশেষ সহায়তা নেমে আসে। তাকে কখনই ব্যর্থতার মুখ দেখতে হয় না।

আল্লাহ তাআলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সকল আবশ্যিক দায়িত্ব অর্পণ করে পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম একটি দায়িত্ব ছিল, নবীজি জনগণের মাঝে পারস্পরিক বিবাদ লেগে গেলে সেখানে ইনসাফ ও সাম্যের সঙ্গে বিচার করবেন। সুরা মায়েদার মাঝে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে,

৬. সহিহ বুখারি : ২/৫৯৩

৭. সহিহ বুখারি

﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾

'সুতরাং আপনি তাদের মাঝে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করুন। আল্লাহর কিতাব থেকে দূরে সরে তাদের মনোবৃত্তির অনুগমন করবেন না'।

সেমতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান জীবনীর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো নবীজির সেই ন্যায়নিষ্ঠ বিচার ও প্রজ্ঞাদ্ভূত সিদ্ধান্ত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সমাজে প্রেরিত হয়েছিলেন যেখানে অজ্ঞতা ও অন্ধকারের প্রাবল্য ছিল। কারও কাছে শক্তি ও প্রতিপত্তি থাকলে সে নিজের অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্যে যথেচ্ছা শক্তিপ্রয়োগ করত। পক্ষান্তরে শক্তিহীন ও দুর্বল প্রকৃতির লোকদের অবস্থা এতটা শোচনীয় ছিল যে, নিজের বৈধ অধিকার থেকেও তাদের নিশ্চুপ বঞ্চিত থাকতে হতো। সেমতে মূর্খতার যুগের একটি রেওয়াজ ছিল, যদি কোনো বংশের নেতৃত্বস্থানীয় কেউ নিহত হয় তাহলে শুধু খুনীকেই হত্যা করলে কিসাস পূরণ হবে না; বরং সেই একজন মানুষের বদলায় খুনীর পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে হত্যা করাই ইনসাফ মনে করা হতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবারের মতো আরবের বুকে সত্যিকারের ন্যায় ও সাম্যপূর্ণ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ ধরনের নিপীড়নমূলক প্রথা খতম করে মানবাধিকার সংরক্ষণ করেন।

ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার অন্যতম কারণ হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো আইন জারি করতেন সর্বাগ্রে সেই আইনের ওপর নিজেই আমল করতেন। সর্বপ্রথম সেই আইনটি নিজের ওপর, নিজের পরিবারের ওপর কার্যকর করতেন। যেমন, বিদায় হজের প্রাক্কালে যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, মূর্খতার যুগের সর্বধরনের রক্তের হিসেব আজ থেকে অকার্যকর ঘোষণা করা হলো, তখন সর্বপ্রথম তিনি নিজের বংশের এক নিহত ব্যক্তির খুন ক্ষমা করেন। এরপর যখন তিনি ঘোষণা করেন যে, মূর্খতা ও বর্বতার যুগে সুদের ওপর যত অঙ্ক ধার্য করা হয়েছিল, আজ থেকে সেগুলোর সকল সুদ মওকুফ করে দেওয়া হলো। তখন সর্বাগ্রে তিনি তাঁর চাচা হজরত আব্বাস রাদি.-এর সুদের অর্থ ক্ষমা করেন, যদিও সেটি ছিল বিশাল অঙ্কের অর্থ।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজের মাধ্যমে

ইনসাফ কায়েমের আহ্বান করেছেন। সেমতে বুখারি ও মুসলিম শরিফের এক যৌথ বর্ণনায় এসেছে যে, একবার মাখযুম গোত্রের অবস্থাসম্পন্ন এক মহিলা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। ইসলামি আইন অনুযায়ী চুরির শাস্তি হলো, হাত কেটে ফেলা। যখন ওই পরিবারের লোকেরা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয় তখন তারা ইচ্ছে করল যে, কাউকে দিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুপারিশ করাবে যে, আপনি মহিলার সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে শাস্তি মওকুফ করুন। এজন্যে তারা হজরত উসামা বিন যায়দ রাদি.-কে রাজি করাল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত যায়দকে খুবই ভালোবাসতেন। সবার ধারণা ছিল যে, নবীজি তার কথা ফেলতে পারেন না। সেমতে হজরত যায়দ রাদি. নবীজির কাছে এসে হজরত যায়দের স্বপক্ষে সুপারিশ করলেন। তখন নবীজি তার ওপর বিরাগভাজন হয়ে বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত হদের ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করতে চাও? নবীজি শুধু এতটুকুতেই থামলেন না। সবাইকে আহ্বান করলেন। সেখানে আম জনতার উদ্দেশে বললেন, এ ধরনের কাজ তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকদের ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মাদের আদরের কন্যা ফাতেমাও চুরি করে তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কর্তন করব।

স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ক্ষেত্রে এতটা ন্যায়নিষ্ঠ ও সাম্যপূর্ণ আচরণ করতেন যে, একবার তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে কিছু অর্থ ঋণ নিয়েছিলেন। কিছু দিন যেতে না যেতেই লোকটি ঋণ পরিশোধের জন্যে তাগাদা দিতে শুরু করল। তাগাদা দেওয়ার সময়ে লোকটি খুবই রুক্ষ ও কর্কষ কথাও বলে ফেলল। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রহমতের নবী হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কেউ ধৃষ্টতা প্রকাশ করবে; এটি জীবনোৎসর্গী সাহাবায়ে কেরাম কখনই মেনে নিতে পারেন না। সেমতে সাহাবায়ে কেরাম সংকল্প করে ফেললেন যে, লোকটিকে তার অভদ্র আচরণের শাস্তি দেবেন। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিষেধ করে বললেন,

دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً

'লোকটিকে ছেড়ে দাও। কেননা সে অধিকারের প্রাপক। আর অধিকার প্রাপক বলার অধিকার রাখেন'।

তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রূঢ় কথার কোনো জবাব

তো দেননি; উপরন্তু ঋণটি পর্যন্ত শোধ করে দিলেন।[৮]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অমুসলিমদের মাঝেও পরস্পরে বাদানুবাদ হলে তারা ফয়সালার জন্যে নবীজির কাছেই ছুটে আসত। কেননা তাদের পোক্ত বিশ্বাস ছিল, নবীজি যে ফয়সালা করবেন সেটি ন্যায়নিষ্ঠ ফয়সালাই হবে। সেমতে হাদিসের কিতাবে এমন অনেকগুলো ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে এক মুসলমান ও এক অমুসলমানের মাঝে কোনো বিষয় নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়, বিষয়টি যখন নবীজির আদালত পর্যন্ত গড়ায় তখন তিনি মুসলমানের বিপক্ষে, অমুসলিমের পক্ষে রায় ঘোষণা করেন।

যার ফলশ্রুতিতে যেই জাযিরাতুল আরব এতদিন পর্যন্ত অজ্ঞতা ও অত্যাচারের নিকষ কালো গহ্বরে নিপতিত ছিল, সেটিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বল্প মেয়াদের ভেতর ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা ও শান্তি-নিরাপত্তার ভূস্বর্গে রূপান্তরিত করে ফেলেন।

হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত লাভের পর তেরো বছর মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি শুধু মক্কা মুকাররমাতেই দ্বীনের দাওয়াত দেননি; বরং এ মিশন নিয়ে তায়েফসহ আশপাশের বিভিন্ন জনপদেও ছুটে গেছেন। সেখানে আল্লাহর বার্তা পৌঁছাতে তিনি কোনো চেষ্টাই বাকি রাখেননি। যাদের কপালে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ ছিল, তারা নবীজির আহ্বান অন্তকরণেও সমাদরে বরণ করে নিয়েছিল। যদিও তারা সংখ্যাই ছিল খুবই অল্প। অধিকাংশ জনগণই নবীজির বার্তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। উপরন্তু তারা যখন দেখতে পেল যে, সত্যানুসন্ধানীরা ধীরে ধীরে নবীজির চারপাশে জড়ো হচ্ছে তখন তারা প্রকাশ্য শত্রুতা ও বৈরীতার তরবারি হাতে নেমে পড়ে। নবীজিসহ সাহাবায়ে কেরামের ওপর নানাবিধ অত্যাচারের স্টিমরোলার চাপিয়ে দেয়। তাওহিদ স্বীকার করা ছিল তাদের চোখে এমন ক্ষমাহীন অপরাধ যে, এর কারণে কারও মানবিক অধিকারটুকু পদদলিত করতেও ওরা পিছপা হয়নি।

অত্যাচার ও নিপীড়নের সেই উপাখ্যান যখন দীর্ঘ হতে শুরু করে তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন। সেমতে সাহাবায়ে কেরামের একটি বিশাল দল প্রথম হাবশা অভিমুখে হিজরত করে। খোদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যেহেতু কাফেরদের তোপের মুখে ছিল; তারা তাকেও নাজেহাল ও পদর্যুস্থ করতে প্রস্তুত

[৮]. বুখারি ও মুসলিম, মিক্কাত শরিফ

ছিল এজন্যে সবাই তখন নবীজিকেও হিজরতের পরামর্শ প্রদান করেন। এসময় মক্কার বাইরের বিভিন্ন স্থানের লোকেরা নবীজিকে তাদের মাতৃভূমিতে চলে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

সহিহ মুসলিম শরিফের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত তুফায়ল বিন আমর রাদি. ছিলেন দূস গোত্রের সর্দার। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গোত্রের কাছে একটি সুরক্ষিত কেল্লা ছিল। তারা তখন নবীজির কাছে অনুরোধ পেশ করেছিলেন যে, আপনি আমাদের কেল্লায় চলে আসুন। নবীজি যেহেতু আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন এজন্যে তাদের অনুরোধে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

এভাবে বনু হামদানের এক ব্যক্তিও অনুরূপ অনুরোধ পেশ করেছিল। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সৌভাগ্য মদিনার আনসারদের কপালেই লেখা হয়েছিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার স্বপ্নেও দেখেন যে, তিনি হিজরতের উদ্দেশে এমন এক অঞ্চলে যাচ্ছেন যেটি শষ্য শ্যামল ও উর্বর। তিনি মনে করেছিলেন, এটি হয়তো ইয়ামামা বা হিজর এলাকা হবে। কিন্তু পরবর্তীতে প্রতিফলিত হয় যে, সেটি আসলে মদিনায়ে তাইয়্যেবা।

মদিনাভিমুখে হিজরত করার কারণ হলো, ওই সময় মদিনার নাম ছিল ইয়াসরিব। এখানে আরব জনগণের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর সংখ্যক ইহুদিও বাস করত। যদিও সেখানকার স্থানীয় মূর্তিপূজারিদের সঙ্গে ইহুদিদের ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে চরম বৈরীতা ছিল, কিন্তু ইয়াসরিবের মূর্তিপূজারিরা ইহুদিদেরকে জ্ঞানে-গুণে নিজেদের চেয়ে উত্তম মনে করত। তাদের সংস্পর্শের কারণে তারা নবুয়ত ও আসমানি কিতাবাদি সম্পর্কে খানিকটা অবগতও ছিল। ইহুদিরা তাদেরকে জানিয়েছিল যে, খুব শীঘ্রই একজন পয়গম্বরের আগমন ঘটবে। যার কারণে তারা আসমানি ধর্মের অনুসারী না হওয়া সত্ত্বেও একজন শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে অস্বচ্ছ ওয়াকিফহাল ছিল।

ওদিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, প্রতি বছর যখন হজের সময় আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোক মক্কায় জড়ো হতেন তখন তিনি দ্বীনের আহ্বান নিয়ে তাদের কাছে ছুটে যেতেন। সেসময় ইয়াসরিবের একজন কবি –নাম সুওয়াইদ বিন সোমিত– হজের উদ্দেশে মক্কায় আগমন করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে তার কাছে আগমন করেন। 'আমসালে লুকমান' নামক কিতাবের একটি অনুলিপি কীভাবে যেন লোকটির হস্তগত হয়েছিল। এটিকে সে আসমানি গ্রন্থ বলে বেড়াত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে